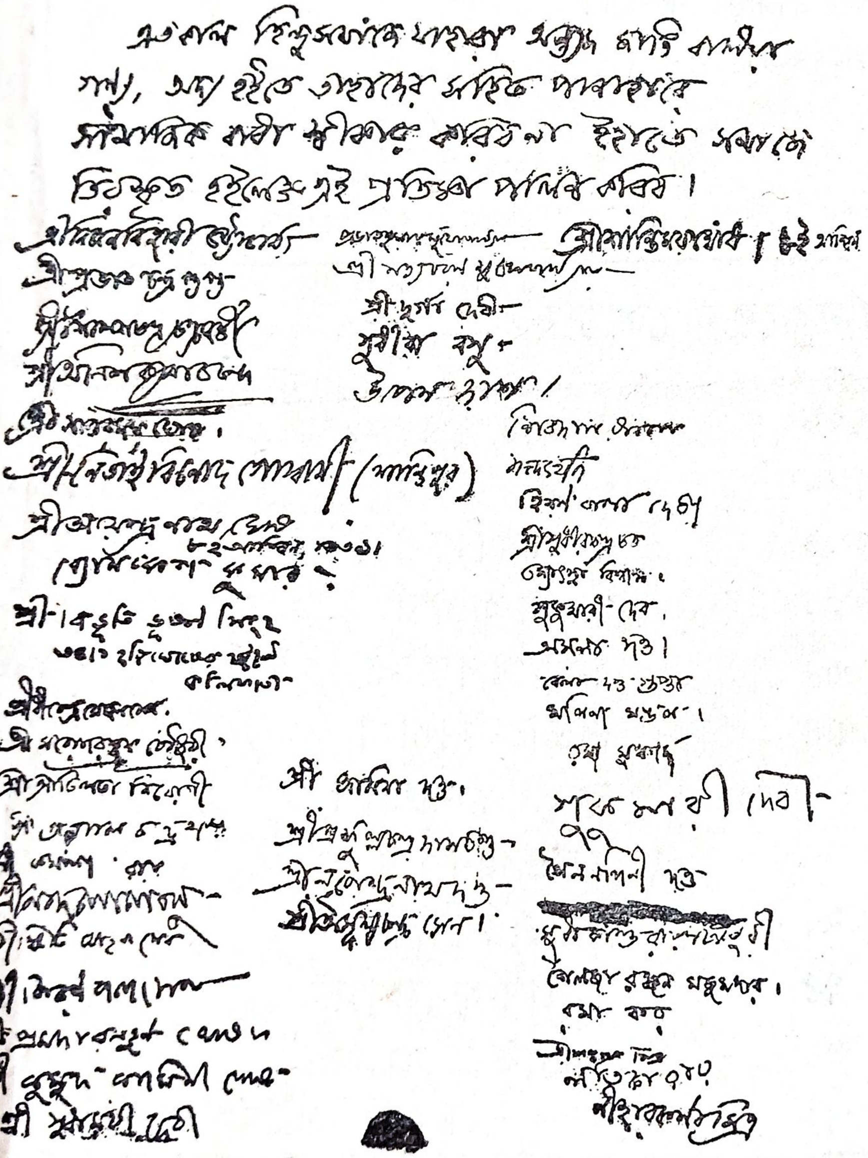
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কারসমিতি

[বিশ্বভারতীর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা]

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়


এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা স্বীকার করিব না ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি তরুণ ছাত্র একটি সমিতি গঠন করেন। তার নাম দেন তাঁরা 'সংস্কার সমিতি।'' [১] সমস্ত (কু-) সংস্কার ত্যাগ করবেন এই ছিল তাঁদের প্রতিজ্ঞা।

"সংস্কারসমিতির'' পাণ্ডাদের অনেকেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে অন্নগ্রহণ তাঁদের বংশে কেউ কখনো করেন নি। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ তো সে বংশে কল্পনারও অতীত ছিল। এমনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তানেরাও সর্বজাতির হস্তে অন্নগ্রহণ, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বহু ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁদের "সংস্কারসমিতি'' কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু, মুসমান, খ্রীস্টান, যে-কোনো সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হলো।

"সংস্কারসমিতির'' উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে' তাঁরা সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানালেন। তাঁদের সেই আহ্বান-বাণীর কিয়দংশ বহুচেষ্টায় উদ্ধার করা গেছে। এখানে তা দেওয়া হলো :—

---

১ সকল প্রকার সংস্কারকে সংস্কার করবার জন্য যে-সমিতি— তাই "সংস্কারসমিতি''।

"সর্বপ্রকার অকল্যাণকর সংস্কার ছিন্ন করিয়া এবং সর্বশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া, এই শ্রেয়সী "সংস্কারসমিতি" যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নিজযুক্তির বিরোধী হইলে এই "সংস্কার সমিতি" সকলের—এমন কি পরব্রহ্মের অনুশাসনও (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র) অগ্রাহ্য করে।

"হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও ইসলামধর্মী সকলকেই এই "সংস্কারসমিতি" আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সকলের অধিকার আছে।

"সংস্কারের দ্বারা আবিল বুদ্ধি মলিন দর্পণের ন্যায়। সেই বুদ্ধিকে বিমল করিলে তাহাতে আলোক প্রকাশিত হয়।"২

স্থির হলো—সমিতির আজীবন সভ্য (Life member)-দের একটা কঠিন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ হিন্দুকে "গোমাংস" এবং মুসলমানকে "শূকরমাংস" ভক্ষণ করতে হবে।

খ্রীস্টানকে কোন্ মাংস ভক্ষণ করানো হবে—সে-সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হলো। সমিতির প্রধান যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন—"খ্রীস্টানকে বাদুড়ের মাংস খেতে দেওয়া হোক।" আর একজন বল্লেন—"নাঃ। কাঠবেরালীর মাংস।" অন্য আর একজন বল্লেন—"ইঁদুরের মাংস।"

সৌভাগ্যের বিষয়, সে সময় কোনো খ্রীস্টান ছাত্র সভ্য-পদপ্রার্থী ছিলেন না। তাই খ্রীস্টান সম্বন্ধে নিষিদ্ধ মাংসের ব্যবস্থা, তখনকার মত স্থগিত রইলো।

সংস্কারসমিতিতে একটিমাত্র মুসলমান ছাত্র সভ্যপদ-প্রার্থী। সে কিন্তু নিরামিষাশী—মাদ্রাজী মুসলমান। কর্তারা ব্যবস্থা দিলেন—"আপাতত যে-কোনো মাংস একদিনের জন্য ভক্ষণ করলেই তাঁকে 'সভ্য' করা যাবে। তাঁকে আমরা 'সভ্য' করলাম—কিন্তু তাঁর নাম-(খোদাগরজী) মাত্র আমাদের খাতাতে রইলো তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন।

হিন্দুসভ্যই বেশি। তাঁদের জন্য গোমাংসের ব্যবস্থা দেওয়া হলো। ছুটির দিনে বাজারে গোমাংস ক্রয় করতে এক সভ্যকে পাঠানো হলো। তিনি পূর্বেই বহু সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন। বাদুড়, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, ব্যাঙ, অনেক কিছুই তিনি উদরস্থ করেন। কেবল গোমাংস না পাওয়ায়, তা ভক্ষণ করতে পারেন নি।

তিনি এবং আমি দুজনে মাংস জোগাড়ের ভার নিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বোলপুর বাজারে 'গোমাংস' পাওয়া গেল না।

এখন কি করা যায়? ঠিক করলাম—খাশির মাংস বড় বড় টুকরায় কাটিয়ে 'গোমাংস' বলে চালাব।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে কেউ গোমাংস চিনতেন না। সুতরাং সেই বড় বড় মাংস খণ্ডগুলিতে হলুদ মাখিয়ে আমরা তা 'বাছুরের মাংস' বলে প্রচার করলাম।

এতেই অনেকে কেটে পড়লেন। এই 'কেটে পড়া' দলে অনেক উৎসাহী কর্মী এবং বক্তা ছিলেন। তাঁরা 'সংস্কার-সমিতির' আদর্শ প্রচারে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের যাতে একেবারে না হারাই—তারই জন্যে, আমরা তিন প্রকার সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

সভ্যদের শ্রেণী তিনটির সংজ্ঞা যাতে সাধারণের বোধ-গম্য হয়—তার জন্য আমরা অত্যন্ত সরল ও চলতি বাংলা-শব্দ ব্যবহার করি। আজ একথা স্বীকার করতে বাধা নাই, সেই সংজ্ঞাগুলি নিতান্ত হাস্যকর হয়েছিল।৩ যাহোক সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ হলো:—

২ এই "আহ্বান-বাণী" সংস্কৃত, বাংলা, ইত্যাদি একাধিক ভাষায় প্রচারিত হয়।

৩ আমরা এখন বৃদ্ধ এবং প্রবীণ। কিন্তু একদিন আমরা বালক এবং তরুণ ছিলাম। বৃদ্ধ ও প্রবীণ পাঠকগণ, তাঁদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, বাল্যখিল্যদের এই চাপল্য আশা করি স্নেহপূর্ণ মার্জনার চক্ষে দেখবেন।

ডেকে পাঠালেন। গোস্বামী আসামাত্র নিদারুণ বর্ষণ শুরু হলো। তীক্ষ্ণ, কঠোর, কটু, তিক্ত, বাক্যধারার অবিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ! মিনিট পনেরো গোস্বামী মুখ খুলবার অবসরই পেলেন না।

অবশেষে শাস্ত্রীমহাশয় যখন পরিশ্রান্ত হয়ে নিবৃত্ত হলেন, তখন গোস্বামী বল্লেন—"জগদানন্দ বাবু৭ জানিয়েছেন—বোলপুরে "গোমাংস" পাওয়াই যায় না। সুতরাং কেউই "গোমাংস ভক্ষণ" করেন নি। ছাগমাংসকেই তাঁরা গোমাংস বলে' প্রচার করেছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় তাতেও বিশেষ শান্ত হলেন না। তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলে চল্লেন—"হিন্দুর ছেলে অন্য মাংসই বা "গোমাংস" বলে, খায় কেমন করে? সংস্কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিকল্প মুখুজ্যেমহাশয়ের বংশধর—এরা এমন কাজ করলো কেমন করে? এইরূপ অনাচারে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এই পবিত্র আশ্রমটিও নষ্ট হতে চলেছে। আমি এখনই গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি!"

গোস্বামী সবিনয়ে জানালেন—"গুরুদেবের কাছে গিয়ে কিছু লাভ হবে বলে' মনে হচ্ছে না। কেননা, এইরূপ নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ব্যাপারকে গুরুদেব তেমন গুরুত্ব দেবেন না।"

শাস্ত্রীমহাশয়কেও সেকথা স্বীকার করতে হলো। অতঃপর তিনি কি করবেন—কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে একজন উৎসাহী আদর্শবাদী শিক্ষক তাঁর বন্ধু এক অতি পুরাতন শিক্ষকের গৃহে উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করলেন। গৃহস্বামী তখন সপরিবারে চায়ের টেবিলে। উত্তেজিত আগন্তুক ঝড়ের বেগে বলে চল্লেন—"আপনারা এখানে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চা খাচ্ছেন—এদিকে যে আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র "বিফ (beef)" খেয়েছে—তার খবর রাখেন?"

বাড়ীর গৃহিণী শুনলেন—"বিষ খেয়েছে!" তিনি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"বিষ খেয়েছে তো আপনি **এখানে** কিজন্যে এসেছেন? যান যান। দেখুন গিয়ে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কিনা—এবং চিকিৎসা হচ্ছে কিনা!"

আগন্তুক বল্লেন—"আরে না না! বিষ নয়—বি—ফ (beef)।"

ভদ্রমহিলা বল্লেন—"বাঁচা গেল! যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই বলুন বিষ নয় 'বিফ'।"

গৃহস্বামী ব্রাহ্ম।৮ "বিফ" খাওয়ার কথায় তাঁর মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা এলো না। তিনি হেসে বল্লেন—"আরে "বিফ" খেয়েছে তো কি হয়েছে?"

আদর্শবাদী আগন্তুক নিতান্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড উত্তেজনা নিতান্তই নিষ্ফল হলো। "সংস্কারসমিতির মহাচুড়ন্তগণের" কোনো ক্ষতিই তাঁরা করতে পারলেন না। সমিতির সভ্যগণ অধিকতর উৎসাহে তাঁদের সংস্কার ভাঙার কাজ করে চল্লেন।

অতঃপর স্থির হলো—স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ দুটি 'গর্হিত' কাজ তাঁরা একসঙ্গে করবেন। কাজ দুটি হলো—চণ্ডালের অন্নগ্রহণ এবং গ্রাম্যশূকরের মাংস ভক্ষণ।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত "চণ্ডালকে" খুঁজে পাওয়া গেল না। হাতের কাছে পাওয়া গেল—তাঁদের চিরপরিচিত রসিক মেথরকে। তাকেই তখনকার মত চণ্ডালের পদগৌরব দিয়ে অনুরোধ করা হলো—তার সহধর্মিণীর রান্না করা শূকর মাংস

৭ শ্রীজগদানন্দ রায়—"গ্রহনক্ষত্র" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতা—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রবীণ অধ্যাপক, Bolpur Union Boardএর Chairman.

৮ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক ও তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক—অধুনা স্বনামধন্য)।

১। মহাচূড়ন্ত[৪] (আজীবন সভ্য—বা Life member)

২। চূড়ন্ত (সাধারণ সভ্য—বা Ordinary member)

৩। উড়ন্ত (অস্থায়ী সভ্য বা Associate member)

যাঁরা চূড়ান্তভাবে সংস্কারসমিতিতে যোগ দিতে পারেন নি—তাঁরাই 'উড়ন্ত সভ্য' অর্থাৎ কি না, মন যাঁদের 'উড়ু' 'উড়ু' করছে।

'উড়ন্ত' শব্দের সঙ্গে মিল রেখে কেউ কেউ চতুর্থ শ্রেণীর আর এক প্রকার 'সভ্য' করার প্রস্তাব আনলেন—তাঁরা তাদের নাম দিতে চাইলেন—'পুড়ন্ত'। আমরা অধিকাংশ সভ্য ওটা বাতিল করে দিলাম। অবশ্য বাতিল করার আগে, ঐ নামের অর্থ ব্যাখ্যার সুযোগ তাঁদের দিলাম।

তাঁরা বল্লেন " 'পুড়ন্ত' অর্থাৎ যাঁরা পুড়ছেন। নিজেরা কুসংস্কারাছন্ন বলে যাঁরা অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন। এর পরই তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করে সংস্কারসমিতিতে যোগ দিবেন।"

আমরা বল্লাম—"কে কে পুড়ছেন, তা যাঁরা পুড়ছেন, তাঁরাই জানেন। আমাদের জানবার কথা নয়। কেন না, আমরা এখনও অন্তর্যামী হতে পারি নাই। অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াটা ভিতরের ব্যাপার। এরপর যখন তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করবেন, তখন তো 'সভ্য' হবার জন্য আমাদের কাছেই আসবেন। সেই সময় ঐ তিন শ্রেণীর যে-কোন একশ্রেণীতে তাঁদের ভর্তি করা যাবে।"

"পুড়ন্ত" সভ্য আমাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত না হলেও আমাদের আলোচনার বহির্ভূত ছিলেন না। আমরা প্রায়ই কারো কারো সম্বন্ধে ঐ সংজ্ঞা প্রয়োগ করতাম।

এদিকে কিন্তু হুলস্থূল ব্যাপার। শান্তিনিকেতনেও যে-এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, তা আমাদের ধারণা ছিল না। সমিতির সভ্যগণ "গোমাংস" ভক্ষণ করেছেন এ সংবাদ আগুনের মত সর্বত্র প্রবলবেগে প্রসারিত হলো -এক বৃহৎ এবং প্রবল গোষ্ঠী, সমিতির সভ্যদের উপর নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের ধারণা—এইরূপ কালাপাহাড়দের মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থান দেওয়া যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাদের বিতাড়িত করতে হবে।

এই বিরুদ্ধ দলের একজন, পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ের[৫] শরণাপন্ন হলেন। ঐ ব্যক্তি এককালে "সংস্কারসমিতির" একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। গোমাংস দেখে "কেটে" পড়েন।

হিন্দুসন্তানের—বিশেষত, বাংলার প্রসিদ্ধ আচারনিষ্ঠ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ-পরিবারের এক সন্তানের "গোমংস ভক্ষণ" শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে অতি ভয়ংকর অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় শিষ্য মঠজ্যেষ্ঠ (Hostel Superintendent) গোস্বামীকে[৬]

---

৪ "সংস্কারসমিতিতে" সে-সময়, মাত্র পাঁচজন মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "মহাচূড়ন্ত" সভ্যের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রায় সবাই আজ দেশ-বিখ্যাত। এখানে তাঁদের নাম দেওয়া গেল।

(১) শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশকর্মী, কবি, সাহিত্যিক, ও শিল্পী)

(২) শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী (এখন স্বনামধন্য সাধক, শিল্পী এবং কবি—শ্রীনিশিকান্ত)

(৩) শ্রীরামকিংকর বেইজ (স্বনামধন্য শিল্পী — "রামকিংকর")

(৪) শ্রীপুলিনবিহারী সেন (রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গ্রন্থন-বিভাগ, বিশ্বভারতী)

(৫) শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)

৫ আচার্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, তদানীন্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাভবন (Post-graduate Research Dept.)।

৬ পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (বিদ্যাভবনের প্রবীণ গবেষক)।

যেন সমিতির সভ্যগণকে সেরখানেক দেওয়া হয়। মাংসের দাম এবং তেল, ঘি, মসলার খরচ তাঁরা দেবেন।

রসিক বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। সংস্কার-সমিতির আদর্শের কথা সে তার নিজের মত করে' এক প্রকার বুঝেছিল। তাই এই পবিত্র সাধন-কার্যে পয়সা নিতে তার ঘোর আপত্তি।

সমিতির সভ্যরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রসিক যা যুক্তি দিল, তাতে দাম দেওয়া, বা খরচ দেওয়ার কথা আর তোলাই গেল না।

রসিক বল্লো—শূকর তার নিজের ঘরের। জীবনে কোনোদিন সে শূকর কেনে নি। তার ঠাকুর দাদার বাবা যা কিনে রেখে গেছলো—তাতেই তারা তিন পুরুষ বিনি পয়সায় মাংস খেয়ে আসছে।

আর, মাংসে তেল, ঘি বা মসলা, তারা কোনো কালেই দেয় না। এক নুন দেয়। তা, তার আর কি বা দাম!

রসিক মেথর বা তার পরিবারের রান্না সেই বরাহমাংস দুজন মহাচূড়ন্ত এবং জনা দুই চূড়ন্ত[৯] সভ্য মিলে শ্রদ্ধাস্পদ "তালধ্বজ"[১০] মহাশয়ের নিবাসে নিঃশেষ করলেন।

সেদিন তো বিনি পয়সায় ভোজ হলো—পরদিন ভোজ দূরে থাক, ভোজনেরি প্রয়োজন হলো না।

শূকর মাংস যে এতদূর গুরুপাক—তা চূড়ন্ত, মহাচূড়ন্ত কোনো সভ্যেরি জানা ছিল না। ইতিহাসে তাঁরা পড়ে ছিলেন বটে, বৃদ্ধবয়সে শূকর মাংস ভক্ষণ করে, বুদ্ধদেব মারাত্মক অসুখে পড়েন।

যৌবনেই সুস্থ, সবল সভ্যদের যা অবস্থা হলো, তাতে বৃদ্ধবয়সে কী হতে পারে—কল্পনা করতে অসুবিধা হলো না!

সৌভাগ্যের বিষয়, প্রৌঢ় তালধ্বজ মহাশয়কে মাত্র একটুকরো মাংস "চাখতে" দেওয়া হয়েছিল—তাতেই তাঁর একদিনের রান্নার পরিশ্রম এবং খরচ বেঁচে যায়।

এইভাবে একটার পর একটা সংস্কারে আঘাত দিতে দিতে, সংস্কারসমিতির সভ্যগণ স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হন। বিরুদ্ধ দলের বাধাদানকে তাঁরা আর তোয়াক্কা করেন না।

সংস্কারসমিতির সর্বশ্রেণীর সভ্যই প্রবল উৎসাহে নবাগত বিদ্বান ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে তাঁদের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন। তরুণদের অনেকেই এখন সংস্কারসমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত—প্রবল বিরোধীপক্ষ ক্রমশ তাঁদের সমর্থক হারাচ্ছেন—এবং সেজন্য তথাকথিত আদর্শবাদী বিদ্যার্থী ও কর্মিগণ ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হয়ে পড়ছেন।

এমন সময় এলো ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস।

সারা ভারতব্যাপী প্রবল উত্তেজনা—মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করেছেন।

আশ্রমবাসিগণ দুঃখে, উদ্বেগে, মুহ্যমান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন; আমাদের দীর্ঘ আশ্রম-জীবনে তাঁকে এরূপ বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। আশ্রমের পুরাণো কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের তিনি বার বার ডেকে পাঠাচ্ছেন; আমাদের কী কর্তব্য সেবিষয়ে

---

৯ এই চূড়ান্ত সভ্যদ্বয়ের একজন হচ্ছেন—শ্রীক্ষেমেন্দ্র-মোহন সেন (বর্তমানে প্রখ্যাত সাংবাদিক)। প্রধানত এঁরই পরিকল্পনায় এবং এঁরই উদ্যোগে সেবারের সেই "সংস্কারমেধ-যজ্ঞ" সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় (গ্রাম্য-) শূকর মাংস হিন্দুর পক্ষে "গোমাংস" পর্যায়ের না হওয়ায়, নিতান্ত আগ্রহ থাকলেও সংস্কার-সমিতির কর্তৃপক্ষগণ এঁকে "মহাচূড়ন্ত" উপাধি দিতে পারেন নি।

১০ শান্তিনিকেতন উপাসনা মন্দিরের পাশে, একটি দীর্ঘ তালবৃক্ষকে কেন্দ্র করে-এক বিচিত্র গৃহ আছে—যার দেওয়াল মাটির এবং চাল খড়ের। রবীন্দ্রনাথ ঐ গৃহের নাম দেন "তালধ্বজ"। এখানে গৃহস্বামী অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনকে "তালধ্বজ" বলা হয়েছে। ঐ গৃহে তিনি একাকী বাস করতেন এবং নিজ আহার্য নিজেই প্রস্তুত করতেন।

আলোচনা করছেন। পুণা থেকে তারযোগে, সংবাদের আদান প্রদান চলেছে।

শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল না! সর্বজাতি, সর্বধর্মাবলম্বী একত্রে একস্থানেই তখন আহার করতেন।

তথাপি সমস্ত দেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন—একথা সকলেই অন্তরে অনুভব করছিলেন।

বিশ্বভারতীর প্রবীণ অধ্যাপকগণ বল্লেন—"আশপাশের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করা হোক। সমবেত গ্রামবাসীদের সেই সভায় আমরা সামাজিকভাবে হরিজনদের জলগ্রহণ করবো।"

কর্মীগণ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গুরুদেবও এতে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মার প্রায়োপবেশনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হলো। গুরুদেব তাঁদের উদ্দেশ্যে সেদিন যা বলেছিলেন, দেবী বাগীশ্বরীর কণ্ঠের ন্যায় তাঁর সেই বাঙ্ময় কণ্ঠ হতেও এমন অমৃত নির্ঝর সুলভ ছিল না। সেদিন সে বাণী যে শুনেছে, সেই তার সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথরের হাতে জল গ্রহণ করেছে। আচারনিষ্ঠ বিধবাগণ পর্যন্ত, সেদিন চোখের জলের সঙ্গে তাঁদের আজন্ম সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। গুরুদেবের সেই অভিভাষণের কিছু পূর্বে কেউ যা কল্পনাও করেন নি, তাই ঘটতে দেখেছিলাম।

৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপকগণ যখন ঐরূপ সামাজিকভাবে হরিজন-হস্তে জল-গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন বিশ্বভারতীর প্রগতিপন্থী তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ সে-প্রস্তাবে তেমন খুশি হন নাই। তাঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু করতে ইচ্ছুক। সুতরাং ঐ প্রস্তাব শোনামাত্র, তাঁরা বর্তমান লেখককে তাঁদের মুখপাত্র করে গুরুদেবের কাছে পাঠালেন।

গুরুদেবকে বললাম—"ছাত্রছাত্রীগণ কেবলমাত্র 'জলচলে' সন্তুষ্ট নন।" ১১

তিনি তখন আমাদের কী ইচ্ছা—তা জানতে চাইলেন। বল্লাম—"সাধারণ পাকশালায়—যেখানে পাচক ব্রাহ্মণগণ পাক করেন, সেখানে আগামী কাল রাত্রে মেথরেরা পাক করবে। তাদের সেই পাক করা অন্ন, তারাই পরিবেশন করবে এবং সমস্ত আশ্রমবাসী তা গ্রহণ করবে।"

গুরুদেব প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে, যেদিন বিশ্বভারতীর সিংহসদনে হরিজনহস্তে জল গ্রহণ করা হয়, সেই দিনই রাত্রে, পাকশালায় মেথরের হাতে অন্নগ্রহণ করা হলো। শান্তিনিকেতনেও এ খুব সহজে হয় নাই। যাঁরা সর্বজাতির অন্নগ্রহণে অভ্যস্ত তাঁরাও মেথরের অন্নগ্রহণে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন।

যাইহোক, সেদিন রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্মিমণ্ডলী, সপরিবারে ঐ সর্বজনীন ভোজে যোগ দিলেন। মেথরগণ তাঁদের স্বহস্তে পক্ব অন্ন (খিচুড়ি) সকলকে পরিবেশন করলো।

কিন্তু পরদিন এক নতুন বিপদ উপস্থিত হলো। পাকশালার দাসদাসীরা কাজ করবে না। ব্রাহ্মণ পাচকগণ কাজে যোগ দিল—কিন্তু হরিজন ঝি-চাকরের দল এলো না।

---

১১ কেবলমাত্র "জলচলে" সন্তুষ্ট না হলেও, যাতে ঐ "জলচল" সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার জন্য সংস্কার-সমিতির সভ্যগণ জনে জনে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের—বিশেষত বিধবাদের নিকট গিয়ে, করজোড়ে আবেদন করতে থাকেন। গুরুজনদের চরণ ধরে' অনুনয় করেন। সন্তানস্থানীয়দের—এই করুণ আবেদন ও অনুনয় বিনয়, তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে।

নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে তাদের বাস। সেখানে গিয়ে আমরা বহু সাধ্যসাধনা করলাম। কিন্তু তারা অটল। মেথরেরা যে-বাসন ছুঁয়েছে—সে বাসন কেবল সেদিন নয়, কোনদিনই তারা (হাড়ি, ডোম, বাউরি, মুচিরা) মাজবে না। শুধু তাই নয়, ঐ পাকশালাতেই তারা আর ঢুকবে না।

কর্তৃপক্ষগণ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তরুণদের নেতারা বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না। তারা বল্লে—"আমরাই বাসন মাজব। শুধু একদিন নয়—দিনের পর দিন।"

তাদের সেই অটল প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা দেখা দিল।

হাসিমুখে দিনের পর দিন তারা ঐ বিরাট পাকশালার, বৃহদাকার, হাঁড়ি, ডেকচি, কড়াই প্রভৃতি দুবেলা মেজে যেতে লাগলো।

কিন্তু বেশিদিন তা করতে হলো না। ঝি-চাকরেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ঐ পাকশালা তাদের জীবিকার উৎস। সমস্ত পরিবার পোষণ হয় ওখানকার অন্নে। কদিন তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে। তাছাড়া, তাদের আশঙ্কা হলো— অন্য জায়গা থেকে লোক আসবে।

একে একে, সকলেই এসে তাদের কাজে যোগ দিল।

৭ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে, গুরুদেব বিশ্বভারতীর কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উত্তরায়ণের "উদয়নে" আহ্বান করেন। গ্রামে গ্রামে, অস্পৃশ্যতাবর্জন ও হরিজন উন্নয়নের জন্য—আমরা কী করতে পারি—এই ছিল সেদিনের আলোচ্য বিষয়।

বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হলো—একটি সমিতি গঠন করা হোক—যার সভ্যেরা গ্রামে গ্রামে কি ভাবে ঐ কাজ করা যায়—তার পদ্ধতি নির্ণয় করবেন। এবং নির্ণীত পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করবেন। ঐ সভাতেই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন—প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়। সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হলেন—বিদ্যাভবনের গবেষক ছাত্র শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)।

সমিতির নাম কি হবে—তাই নিয়ে বহুক্ষণ বাদ প্রতিবাদ চলতে লাগলো, অবশেষে তরুণদের নায়ক বল্লেন—"সংস্কার সমিতি" নামে আমাদের একটি সমিতি—পূর্ব হতেই ঐ ধরণের কাজ করে আসছে—ঐ নাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা ঐ সমিতি উঠিয়ে দিয়ে— একত্রে কাজ করি।"

সভায় বজ্রপাত হলেও সভ্যগণ হয়তো ততটা চমকে উঠতেন না। আমাদের এই আচম্বিত প্রস্তাবে সেই সভায় উপস্থিত অনেকেরই মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল— গুরুদেবের ভাষাতেই তার বর্ণনা দিই :

"মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন "পাষণ্ডের" হেরি অহংকার।"

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও গুরুদেব প্রগতিপন্থী তরুণদের প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর "সংস্কারসমিতি" পুর্নজন্ম গ্রহণ করলো। তরুণদের আগ্রহে গুরুদেব এই "সংস্কারসমিতির" পৃষ্ঠপোষক (patron) হলেন।

মহাত্মাজীর উপবাসের কিছুদিন পূর্ব হতে শান্তিনিকেতনে "কালের যাত্রা" নামক—রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি নাটকের মহড়া চলছিল। নাটকটির বিষয় বস্তু হচ্ছে—

জগন্নাথের রথযাত্রা। রথ টানা হচ্ছে -কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রথ চলছে না। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে টানছেন। ক্ষত্রিয় বীরেরা যোগ দিয়েছেন। বৈশ্য বণিকগণ তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন—তথাপি রথ অচল।

অবশেষে যখন সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবজ্ঞাত

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ে আছি—সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো :—

"মহাত্মাজীর উপবাসে, আমি অভিনয় করছি, তাঁর বেদনা আমাকে স্পর্শ করেনি—করেছে তোমাদের কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের।

"এ নাটকটা কী—তারা কি তা বোঝে না!

"এই নাটকের রিহার্সেলে যারা দোষ দেখে—রতনকুটীরে সন্ধ্যেবেলায় তাদের প্রতিদিনের "ব্রিজ খেলা" কি বন্ধ হয়েছে?"

অপরাধীর ন্যায়, ভয়ে, উদ্বেগে, কম্পিত হৃদয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি সেই লিখিত তুলট কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,

যাও। নিয়ে যাও।[১৩] তোমাদের ঐ অধ্যাপকদের কাছে। এই 'প্রতিজ্ঞাপত্রে' সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?"

"অত্যন্ত ভীত স্বরে প্রশ্ন করলাম: "আমি সই করবো।"

তিনি বল্লেন—"তোকে[১৩] করতে হবে না। তোর উপর আমার সে বিশ্বাস আছে।

যাদের কথা বলছি—তাদের সই নিয়ে আয়।"

হায় ভগবান। সেকালের প্রাচীন, সরল, অকপট মানুষ। মনে তাঁর এ সন্দেহ কখনো জাগেনি যে—এখানে আমরা অম্লান বদনে, অকম্পিত হস্তে, বহু প্রতিজ্ঞাপত্র সই করি—অথচ জীবনে তা পালন করি না।

সেদিন অপরাহ্নেই রবীন্দ্রনাথ পুণা রওনা হলেন। আমি সেই প্রতিজ্ঞা পত্রে সই সংগ্রহের জন্য, ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

দিনেন্দ্রনাথ (ঠাকুর)-ই তখন আমাদের "কালের যাত্রার" রিহার্সেল চালাচ্ছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে রিহার্সেলের সময়, সমস্ত শুনে তিনি বল্লেন—'দেখ বাপু, পুণা থেকে ফিরে এলে—তুমি যেন আবার ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রটি ওঁকে ফিরিয়ে দিতে যেও না।'

তাঁরই পরামর্শে ওই বহুজনের সইকরা প্রতিজ্ঞা পত্রটি আমি আর রবীন্দ্রনাথকে দিই নাই। তিনিও আর সেটার খোঁজ করেন নি।

(৩)

সংস্কারসমিতির সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হরিজন উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করলো।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর, বিকেলে তারা খেলাধুলা ছেড়ে, অতি উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করে যেতো। তখন তাদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা এসেছিল।

শুধু শান্তিনিকেতনে কেন, গান্ধীজির জীবন রক্ষার জন্য সারা ভারতবর্ষে তখন অস্পৃশ্যতা-বর্জনের কাজ প্রবলভাবে চলেছিল। এই সুযোগে, আর্যসমাজ, পুনরুদ্যমে প্রদেশে প্রদেশে, নতুন নতুন কর্মীকে এই অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যে নিযুক্ত করতে লাগলেন।

বাংলাদেশেও যাতে এই কাজ অধিকতর ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর নিকট কর্মী চেয়ে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ আমাকেই ঐ কাজে যোগ দিতে বলেন।

তখন প্রায় পনেরো বছর আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করছি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হতে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে, শিক্ষাভবন হতে বিদ্যাভবনে আমার শিক্ষা চলেছে। আমি যে আবার কখনো শান্তিনিকেতন ছেড়ে বাইরে যাবো—তা

---

১৩ যাকে সর্বদা "তুই" বলে সম্বোধন করতেন—তাকেই ক্রুদ্ধ অবস্থায় "তুমি" সম্বোধন করেছেন। ক্রোধ শান্ত হওয়ায়; পুনরায় স্বাভাবিক সম্বোধনে আশ্বস্ত করেছেন।

নিপীড়িতের দল এসে রথের রসি ধরলো—তখন রথ চললো।[১২]

মহাত্মাজীর উপবাসের সময়—তরুণ অধ্যাপকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন—"এই সময় নাটক অভিনয় করা বা তার রিহার্সেল দেওয়া—কি ঠিক হচ্ছে ?"

৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে পাকশালার দিকে রওনা হয়েছি—এমন সময়—রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জরুরী আহ্বান এলো।

উত্তরায়ণে প্রবেশ করে দেখি—রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ—"কোনার্কের" বাইরের বারান্দায় তাঁর টেবিলের উপর একখানি সাদা তুলট কাগজে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে :

"এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

গভীর মনোযোগের সহিত লেখাটি পড়ছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। তাঁর তখনকার সেই মূর্তি কোনদিন ভুলবো না।

পূর্বেই বলেছি, মহাত্মার উপবাসের সময় তিনি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম—তা সারা-জীবনে আর কখনো দেখিনি।

তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রুকুটি-পূর্ণ। শরীর কম্পমান। সেই "ভীষণ মধুর" অপরূপ রূপের দিকে

---

১২ "কালের যাত্রা" নাটকে "কবির" ভূমিকা স্বয়ং কবিই গ্রহণ করেছিলেন। কয়েকদিন মহড়া চলার পর খেয়ালী কবি হঠাৎ আমাকে "কবি"র পাঠ করতে বল্লেন। আমি হতভম্ব। জনতার মধ্যে এক সাধারণ পাঠমাত্র আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই আমাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পাঠ দিতে চাচ্ছেন—এও কি সম্ভব ?

আমি প্রবল আপত্তি জানালাম। রবীন্দ্রনাথ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বল্লেন :

"তোর ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ওদের (পতিতদের) উপর পড়ুক।"

এর পর আর কথা বলা গেল না।

লাইব্রেরীর বারান্দায় "কালের যাত্রা" উপর্য্যুপরি দুদিন (৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর) অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্তক্ষণ "মঞ্চের" এক পাশে বসে' অভিনয় দেখেছিলেন।

মনে আছে দ্বিতীয় দিন ক্ষণেকের জন্য পাঠ ভুলে গেছলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, হয় তো আর বিশেষ কারো তা লক্ষ্যগোচর হয় নি।

"কালের যাত্রা"র সমস্ত অভিনয়, মোটের উপর ভালই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। নাটকটির "দর্শনী" লব্ধ অর্থ (১৯০) সংস্কারসমিতির তহবিলে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য—৪ঠা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর এবং ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন সেই বাংলা ভাষণ দুটি, প্রথমটির ইংরেজি অনুবাদ, অনশন উপলক্ষ্যে মহাত্মাজীর সঙ্গে "তারের" আদান-প্রদান, Message on Mahatmaji's birth day প্রভৃতি প্রবন্ধ—*Mahatmaji and the Depressed Humanity* এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সত্ত্ব সংস্কারসমিতিকে দেওয়া হয় (Proceeds from the sale of this book will go to the SAMSKARA-SAMITI, VISVA-BHARATI, for helping in its work of removing untouchability.)

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে "সংস্কার-ভবন" (প্রাক্তন "বাগানবাড়ী") ভেঙে পড়ে।

"সংস্কার ভবন"[১৪] লুপ্ত হওয়ায় শান্তিনিকেতনে দুঃস্থ হরিজন বালকদের শিক্ষার সুযোগও প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু বিশ্বভারতীর অন্যত্র—শ্রীনিকেতনে তাদের শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে এবং দিন দিন তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। "শিক্ষাসত্রে" বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্পসদনে বৃত্তিকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহু দুঃস্থ হরিজন সন্তান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামে, গ্রামেও তাঁদের উন্নয়ন কার্যে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-কর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। হরিজনদের গ্রাম্য পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা ক্রমশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের আজকের এই পরিবেশ অতিক্রম করে দৃষ্টি আমার ছুটে চলেছে—সুদূর অতীতের সেই দিনে—যেদিন উদার-হৃদয় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে, তাঁরই অনুপ্রেরণায়, কয়েকটি তরুণ কিশোর খেলাচ্ছলে এই আশ্রমের ধূলিতে একটি বীজ বপন করেছিল। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়ে, সকলকে শীতল ছায়া এবং সুমিষ্ট ফল প্রদান করছে।

সেদিনের সেই কিশোরেরা, আজ কেউ প্রৌঢ়, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বা মৃত, কেউ বা মুমূর্ষু। আজকের এই মহীরুহের ছায়ায় বসে, যখন এ যুগের সর্বজাতির সর্বধর্মের ছেলে-মেয়েরা, সর্বজনীন বনভোজন করছে—তখন কি তারা কল্পনা করতে পারে, একদিন এখানের এই মাটীতে এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ-পংক্তিতে ব্রাহ্মণ শিশুগণ আহারে বসতে, তাঁদের প্রথমে পরিবেশন করে' তবে ব্রাহ্মণ পাচকগণ, ব্রাহ্মণেতর জাতির পংক্তিতে অন্ন বিতরণ করতো।

উদার-চরিত রবীন্দ্রনাথ, বিভিন্ন মতবাদী, সকল সম্প্রদায়ের বিদ্বান ও বিদ্যার্থীকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছেন। কারো মত পরিবর্তনের জন্য, বলপ্রয়োগ দূরে থাক—কঠোর বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ করেন নি।

কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, তাঁর আচরণ, তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় কিশোর প্রাণে যে-মহান আদর্শের উন্মাদনা এনেছিল—তাতেই "অচলায়তনের" ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে।

---

১৪ "সংস্কারসমিতি" ও "সংস্কার-ভবন" এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেছেন। "সংস্কার-ভবনের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুধীর চন্দ্র কর মহাশয়কে অনেকে "সংস্কারসমিতির" প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রবীন্দ্রজীবনী"তেও (তৃতীয় খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) এইরূপ গোলমাল দেখা যায়।

প্রথম পর্যায়ের "সংস্কার-সমিতি" গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। সেই সমিতির আদি সভ্যগণের কেউ-ই নিজেকে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলে, প্রচার করতে চান নি। এবং আজও চান না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের "সংস্কারসমিতি" (যার মধ্যে প্রাক্তন "সংস্কারসমিতি," প্রাক্তন সভ্যগণের, সকলের সমবেত ইচ্ছায়—অন্তর্ভুক্ত হয়) উত্তরায়ণের "উদয়ন" গৃহে, ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমিতিটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে, নির্দেশে এবং তাঁরই পৌরহিত্যে সমস্ত আশ্রমবাসীগণের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সমক্ষে গঠিত হয়। সুতরাং তাঁকেই সংস্কার-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলা উচিত।

"রবীন্দ্রজীবনীতে" রবীন্দ্রজীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।